

গগন চৌধুরীর স্টুডিও



একটা ফ্ল্যাট দিনের বেলা দেখে পছন্দ হলেও, সেখানে গিয়ে থাকা না অবধি তার সুবিধে-অসুবিধেগুলো ঠিক বোঝা যায় না। সুধীন সরকার এইটেই উপলব্ধি করল ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাটে বসবাস আরম্ভ করে। এই একটা ব্যাপারেই ভাগ্যলক্ষ্মী একটু শুকনো হাসলেন ; না হলে তিনি যে সুধীনের প্রতি সবিশেষ প্রসন্না তার নজিরের অভাব নেই।

যেমন তার পদোন্নতির ব্যাপারটাই ধরা যাক। সে এখন আপিসের একটি ডিপার্টমেন্টের হেড। ঠিক এত তাড়াতাড়ি মাথায় পৌঁছানোর কথা নয় ; হাজার হোক তার বয়সটা তো বেশি নয়—এই আষাঢ়ে একত্রিশে পড়েছে সে। ডিপার্টমেন্টের কাঁধ অবধি এমনিতেই উঠেছিল সুধীন। মাথায় ছিল নগেন্দ্র কাপুর, যার বয়স চল্লিশ, যিনি দীর্ঘাঙ্গী, সুপুরুষ, কর্মক্ষম ; যিনি ছাই রঙের সাফারি সুট পরে আপিসে ঢুকলে সকলের দৃষ্টি চলে যায় তাঁর দিকে। সেই নগেন্দ্র কাপুর যে অকস্মাৎ টালিগঞ্জের গল্ফের মাঠে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাবেন সে কি কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল ? এই মৃত্যুর পরেই সুধীন দেখল প্রায় প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সে কাপুরের জায়গা অধিকার করে বসেছে। এটা অবিশ্যি শুধু কপালজোরে নয় ; সুধীন এই পদের উপযুক্ত নয় এ অপবাদ তাকে কেউ দেবে না।

তারপর এই ফ্ল্যাট। সুধীনের বাপ মা তাকে সংসারী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, সময়টাও ভালো, কাজেই সুধীনকে বাধ্য হয়েই সে অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছে। আগে পার্ক সার্কাসে যে ফ্ল্যাটটা ছিল, তার পায়রার খোপের মতো দুখানা ঘরে সংসার করা চলে না। তাছাড়া কাছেই ছিল একটা বিয়ে-সাদিতে ভাড়া দেওয়ার বাড়ি। অষ্টপ্রহর গ্রামোফোন রেকর্ডে সানাইয়ের বিকৃত বাঁশফাটা সুরে সুধীনের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। দালালের কাছ

থেকে খবর পেয়ে সুধীন প্রথম যে ফ্ল্যাটটা দেখতে গেল সেটাই হল ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাট। দোতলার ফ্ল্যাট, তিনখানা বেশ বড় বড় ঘর, দুটো বাথরুম, দক্ষিণে বারান্দা, মেঝের মোজেইক, জানালার গ্রিল, ফ্ল্যাটের প্ল্যান—সব কিছুতেই সুপরিকল্পনা ও সুরুটির ছাপ। ভাড়া আটশো। সর্বোপরি বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে মোটামুটি সন্তোষজনক ব্যক্তি হিসেবে মনে হয়। সুধীনের আর দ্বিতীয় কোনো ফ্ল্যাট দেখতে হয়নি।

দু সপ্তাহ হল সে এসেছে এই ফ্ল্যাটে। প্রথম কদিন অত খেয়াল করেনি, তারপর একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখল তার চোখে বাইরে থেকে বিজলী আলো এসে পড়েছে। বেশ উজ্জ্বল আলো। এত রাতে আলো আসে কোথেকে?

সুধীন বিছানা ছেড়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সারা পাড়া অন্ধকার, কেবল একটি আলো জ্বলছে রাস্তার উল্টো দিকের প্রাচীন অট্টালিকার তিনতলার একটি ঘরে। খোলা জানালার পর্দার উপর দিয়ে সটান এসে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকেছে সুধীনের ঘরে। শুধু ঘরে নয়, একেবারে সুধীনের বিছানায়। বালিশ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে শুলেও সে আলো পড়বে সুধীনের মুখে।

এ তো বড় জ্বালাতন! ঘর অন্ধকার না হলে মানুষ ঘুমোয় কী করে? অন্তত সুধীন সেটা পারে না। এটা কি রোজই হবে নাকি?

আরো এক সপ্তাহ দেখার পর সুধীন বুঝল এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। বারোটার কিছু আগে থেকেই আলোটা জ্বলে, এবং জ্বলে থাকে ভোর অবধি। অথচ নিজের ঘরের দক্ষিণের জানালা বন্ধ করে শোয়ায় সুধীনের ঘোর আপত্তি। কার না হয়? কলকাতায় ওই একটি জিনিসের অনেক দাম। দক্ষিণের জানালা। বিশেষ করে তার সামনে যদি অন্য কোনো বাড়ি না থাকে। সেটাও এ ফ্ল্যাটের একটা লোভনীয় দিক। জানালার সামনে রাস্তার ওপরে হল ওই পুরনো বনেদি বাড়িটার সংলগ্ন বাগান, যেখানে অদূর ভবিষ্যতে নতুন দালান ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। বাড়িটা কোনো এককালীন জমিদারের সেটা বোঝাই যায়। সংস্কার হয়নি বহুদিন, লোকজনও বিশেষ থাকে বলে মনে হয় না।

এক ওই তিনতলার ঘরে ছাড়া।

কোনো অজ্ঞাত কারণে ওই ঘরের বাসিন্দা সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখেন।

একতলার ফ্ল্যাটে ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন সোমেশ্বর নাগ। সুধীনের মাস চারেক আগে ইনি এসেছেন এই ফ্ল্যাটে। বছর পঞ্চাশ বয়স, বেঙ্গল ক্লাবের মেমবার, সন্ধ্যাটা তিনি ক্লাবেই কাটান। এক শনিবার বিকেলে বাড়ির গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সুধীন তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ বাক্যালাপের লোভ সামলাতে পারল

না।

‘আমাদের উল্টোদিকের বাড়িটা কাদের বলুন তো?’

‘চৌধুরী। কেন, কী ব্যাপার?’

‘না, মানে, বাড়িতে তো বিশেষ কেউ থাকে-টাকে বলে মনে হয় না, অথচ তিনতলার একটা ঘরে সারারাত বাতি জ্বলে। সেটা লক্ষ করেছেন?’

‘না, তা তো করিনি।’

‘আপনাদের ঘরে আসে না আলো?’

‘সেটা তো সম্ভব নয়। ওদের ছাতের পাঁচিলটা সামনে পড়ে তো। আমরা তো ঘরটাই দেখতে পাই না।’

‘খুব বেঁচে গেছেন। আমার তো রাত্রে ঘুমই হয় না ওই আলোর জন্য।’

‘ভেরি স্ট্রেঞ্জ। শুনেছি তো ওই এতবড় বাড়িতে একটি কি দুটি মাত্র প্রাণী থাকে। মালিক হলেন গগন চৌধুরী। তাঁকে বড় একটা দেখা-টোকা যায় না। আমি তো এসে অবধি দেখিনি। তবে আছেন বলে জানি। বয়স হয়েছে বোধহয়। শুনেছি এককালে ছবি-টবি আঁকতেন। আপনি এক কাজ করুন না। ভদ্রলোককে গিয়ে সোজাসুজি বলুন। অন্তত ওঁর নিজের ঘরের জানালাটা তো বন্ধ করে দিতে পারেন। এতটুকু কনসিডারেশন হবে না প্রতিবেশীর জন্য?’

এ কাজটা অবিশ্যি করা যায়, যদিও সহজ নয়। অনুরোধ করলেও সেটা যে গ্রাহ্য হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। রাত্রে কী ঘটনা ঘটে ওই গগন চৌধুরীর ঘরে?

সুধীন বুঝতে পারল, আলোর জন্য ব্যাঘাতের প্রশ্নটা বড় ঠিকই, কিন্তু ওই প্রাচীন অট্টালিকার ওই ঘরে কী ঘটছে সেটা জানার আগ্রহও কম নয়। তার বন্ধু মহিম রেসের মাঠে যাতায়াত করে; তার একটি বড়ো বাইনোকুলার আছে। সেটা দিয়ে দেখলে কিছু জানা যাবে কি? বাইনোকুলারের দরকার এই জন্যই যে ঘরটা নেহাত কাছে নয়। চৌধুরীদের বাড়িটা ঠিক রাস্তার উপরে নয়; পাঁচিল পেরিয়ে সামনে বেশ খানিকটা জায়গা আছে যেটা বাগানেরই অংশ। এই দূরত্বের পরেও আরও দূরত্ব আছে, কারণ তিনতলার ঘরটা ছাতের খানিকটা অংশ পেরিয়ে।

মহিমের বাইনোকুলারে জানালাটা চলে এল অনেকখানি কাছে, কিন্তু পর্দার উপর দিয়ে দেয়ালের খানিকটা অংশ ছাড়া বিশেষ কিছু দেখা গেল না। দেয়ালে টাঙানো তেল রঙে আঁকা দুটি আবক্ষ প্রতিকৃতির খানিকটা করে অংশ দেখা যাচ্ছে সীলিং-এর ওই আলোতে। তাহলে কি শিল্পীর ঘর? এটাই কি ছিল ভদ্রলোকের স্টুডিও? কিন্তু সেখানে কি কোনো মানুষ নেই?

হ্যাঁ, আছে। এইমাত্র জানালার পর্দায় ছায়া ফেলে একটা মূর্তি ডান থেকে বা

দিকে চলে গেল। কিন্তু ছায়া থেকে মানুষ চেনা গেল না। পর্দায় আলোটা পড়াতে তার স্বচ্ছতাও অনেকটা কমে গেছে।

প্রায় পনের মিনিট দেখার পর সুধীনের ক্লাস্তি এল। যেটুকু ঘুমের সম্ভাবনা তাও কি সে নষ্ট করবে এই ছেলেমানুষী করে ?

বাইনোকুলারটা টেবিলের উপর রেখে সুধীন শুয়ে পড়ল। সে মনে মনে স্থির করে নিয়েছে কী করা দরকার।

সোজা গিয়ে গগন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাঁকে বলবে তাঁর ঘরের উত্তরের দিকের জানালাটা বন্ধ রাখতে। এতে কাজ হলে হবে, না হলে সুধীনের এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। গগন চৌধুরী লোকটা কিরকম সেটা জানা থাকলে ভালো হত—প্রতিবেশীর কাছ থেকে অভদ্র অপমানসূচক ব্যবহার হজম করা খুব কঠিন, তা তিনি যতই প্রবীণ হন না কেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া গতি নেই।

গেটটা খোলা, এবং দারোয়ান নেই দেখে সুধীনের একটু অবাক লাগল ; কিন্তু প্রথম বাধা এত সহজে অতিক্রম করতে পারায় সেই সঙ্গে একটু নিশ্চিন্তও লাগল। সে রাত্রেই যাওয়া স্থির করেছে, কারণ ভদ্রলোক দেখতে চাইলে তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারবে আলোটা কীভাবে তার ঘরে পড়ে।

ভবানীপুরের ভদ্রপাড়া শীতকালের রাত এগারোটার মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। গতকাল পূর্ণিমা ছিল ; চৌধুরীবাড়ির আগাছায় পরিপূর্ণ বাগানের সব কিছুই জ্যোৎস্নার আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শ্বেতপাথরের নারীমূর্তি ডাইনে ফেলে সুধীন এগিয়ে গেল নোনা ধরা গাড়িবারান্দার দিকে। এখনো তিনতলার ঘরে আলো জ্বলেনি। কপাল ভালো হলে গগন চৌধুরীকে হয়তো নিচেই পাওয়া যেতে পারে।

সদর দরজার কড়া নাড়তে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটি ভূতাস্থানীয় প্রৌঢ় দরজা খুলে প্রশ্ন করল—‘কাকে চাই ?’

‘চৌধুরী মশাই—গগন চৌধুরী—তিনি কি শুয়ে পড়েছেন ?’

‘না।’

‘তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যায় কি ? আমার নাম সুধীন সরকার। আমি থাকি ওই সামনের বাড়িতে। একটা বিশেষ কাজে এসেছি।’

চাকর ভিতরে গিয়ে আবার মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরে এল।

‘আপনি আসুন।’

সব ব্যাপারটাই যে সহজে হয়ে যাচ্ছে—এ তো ভারী আশ্চর্য !

ভিতরে ঢুকে ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে একটা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকল সুধীন।

‘বসুন।’

জানালা দিয়ে এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে সোফার উপর, তাই সুধীন সেটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে বসল। চাকর বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল না কেন? এখন তো পাড়ায় লোডশেডিং নেই।

এবারে ঘরের চারদিকে চোখ ঘোরাতে সুধীনের স্বপ্নমন্ডন হঠাৎ দেখতে দেখতে দ্বিগুণ হয়ে গেল।

সে কি ঘর ভর্তি লোকের মধ্যে এসে পড়ল নাকি? তাকে ঘিরে কারা চেয়ে রয়েছে তার দিকে?

ঘরের প্রায়াক্ষকারে দৃষ্টি আরেকটু অভ্যস্ত হতে সুধীন বুঝতে পারল যারা চেয়ে রয়েছে তারা মানুষ নয়, মুখোশ। প্রত্যেকটি মুখোশের চোখের চাহনি যেন তারই দিকে ঘোরানো। এসব মুখোশ যে এ দেশের নয় সেটাও বুঝেছে সুধীন। দেখে মনে হয় অধিকাংশই আফ্রিকার, কিছু দক্ষিণ আমেরিকার হতে পারে। সুধীন এককালে ভালো ছবি আঁকত, বাপের আপত্তি না থাকলে হয়তো সেটাকেই সে পেশা করত। হাতের নানারকম কাজ সম্বন্ধে তার এখনো যথেষ্ট কৌতূহল আছে।

সুধীন মনে মনে নিজের সাহসের তারিফ না করে পারল না। অন্ধকার ঘরে মুখোশ পরিবৃত্ত এই ভৌতিক পরিবেশে অনেকেরই দাঁতকপাটি লেগে যেত।

ঘরে যে কখন লোক প্রবেশ করেছে তা সুধীন টের পায়নি। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন শুনে চমকে পাশ ফিরে সোফায় বসা মানুষটাকে দেখতে পেল।

‘এত রাতে?’

সুধীন হাত দুটোকে প্রায় যন্ত্রের মতো সামনে তুলে নমস্কার করে কথা বলতে গিয়েও পারল না।

ইনি যে অভিজাত পরিবারের সন্তান তাতে কোনো সন্দেহ নেই—পরনে দোরোখা শালই তার পরিচয় দিচ্ছে—কিন্তু গায়ের রঙে এমন পাংশুটে রক্তহীন ভাব, আর চোখের চাহনিতে এমন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা সুধীন কখনো দেখেনি। এমন ব্যক্তিকে প্রথম দর্শনে কারুরই মুখ দিয়ে চট করে কথা বেরোবে না।

ভদ্রলোক নিষ্পলক দৃষ্টিতে সুধীনের দিকে চেয়ে আছেন। প্রায় এক মিনিট লাগল সুধীনের নিজেকে সামলে নিতে। তারপর সে মুখ খুলল।

‘আমি একটা, মানে, অভিযোগ জানাতে এসেছি—কিছু মনে করবেন না। আপনিই গগন চৌধুরী তো?’

ভদ্রলোক একবার শুধু মাথাটা নাড়িয়ে জানিয়ে দিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি। প্রশস্ত ললাটের তিনদিক ঘিরে সিংহের কেশরের মতো আধপাকা চুল থেকে মনে হয় বয়স পঁয়ষট্টির কম না।

সুধীন বলে চলল, 'আমার নাম সুধীন্দ্রনাথ সরকার। আমি সামনের বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে থাকি। আসলে হয়েছে কি, আপনার তিনতলার ঘরের বাতিটা সারা রাত জ্বলে বলে বড্ড অসুবিধা হয়। আলোটা সোজা আমার মুখের উপর এসে পড়ে। যদি আপনার জানালাটা বন্ধ করে রাখতে পারতেন!—নইলে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়। সারাদিন আপিস করে রাস্তিরে ঘুমোতে না পারলে...'

ভদ্রলোক এখনো একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সুধীনের দিকে। এই ঘরের কি কোনো আলোই জ্বলে না নাকি?

অগত্যা সুধীনই আবার মুখ খুলল। ব্যাপারটাকে আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার।

'আমি যদি জানালা বন্ধ করি তাহলেও আলো আসবে না ঠিকই, কিন্তু দক্ষিণের জানালা তো, তাই...'

'আপনার জানালা বন্ধ করতে হবে না।'

'আজ্ঞে?'

'আমিই করব।'

হঠাৎ যেন একটা বিরাট ভার নেমে গেল সুধীনের বুক থেকে।

'ওঃ, তাহলে তো কথাই নেই। অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনি উঠছেন?'

সুধীন ওঠার উদ্যোগ করছিল ঠিকই, কিন্তু এই প্রশ্নে একটু অবাক হয়েই আবার বসে পড়ল—'রাত হল তো। আর আপনিও নিশ্চয়ই শুতে যাবেন।'

'আমি রাত্রে ঘুমোই না।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি সুধীনের দিক থেকে এক চুল নড়েনি।

'লেখাপড়া করেন বুঝি?' সুধীন ধরা গলায় প্রশ্ন করল। এই পরিবেশে গগন চৌধুরীর সামিধ্য যে খুব স্বস্তিকর নয় সেটা স্বীকার করতেই হবে।

'না।'

'তবে?'

'ছবি আঁকি।'

সুধীনের মনে পড়ে গেল বাইনোকুলার দিয়ে ঘরের দেয়ালে পেন্টিং দেখে মনে হয়েছিল সেটা চিত্রকরের স্টুডিও হতে পারে। নাগ মশাইও বলেছিলেন ইনি এককালে ছবি আঁকতেন।

'তার মানে ওই ঘরটা আপনার স্টুডিও?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'কিন্তু সে কথা বোধহয় পাড়ার বিশেষ কেউ জানে না?'

গগন চৌধুরী একটা শুকনো হাসি হাসলেন।

‘আপনার সময় আছে ?’

‘সময়, মানে...’

‘তাহলে কতগুলো কথা বলি। অনেক দিনের জমে থাকা কথা। কাউকে বলার সুযোগ হয়নি কখনো।’

সুধীন অনুভব করল ভদ্রলোকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।

‘বলুন।’

‘পাড়ার লোকে জানে না কারণ জানার আগ্রহ নেই। একটা লোক সারাটা জীবন শিল্পচর্চা করে গেল, কিন্তু সে সম্বন্ধে কারুর কোনো কৌতূহল নেই। এককালে যখন এগজিভিশন করেছি, তখন কেউ কেউ এসে দেখেছে, অল্প বিস্তর সুখ্যাতিও করেছে। কিন্তু যখন হাওয়া বদলাতে শুরু করল, মানুষের যে ছবি রক্তমাংসের মানুষ বলে চেনা যায় তার কদর আর যখন রইল না, তখন থেকে আমি গুটিয়ে নিয়েছি নিজেকে। নতুনের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলতে আমি শিখিনি। মনে মনে দা ভিক্ষিকে শুরু বলে মেনেছিলাম; এখনও তিনিই আমার শুরু।’

‘কিন্তু...আপনি কিসের ছবি আঁকেন?’

‘মানুষের।’

‘মানুষের?’

‘পোর্ট্রেট।’

‘মন থেকে?’

‘না। সেটা আমি পারি না, শিখিনি। আমার সামনে কেউ এসে না বসলে আমি ছবি আঁকতে পারি না।’

‘এই মাঝরাত্তিরে—?’

‘আসে। মডেল আসে। সিটিং দেয়। রোজই আসে।’

সুধীন কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে বসে রইল। এ কেমনতরো কথাবার্তা বলছেন ভদ্রলোক? এ যে পাগলের প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে!

‘বিশ্বাস হচ্ছে না!’ গগন চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে এই প্রথম একটা পরিষ্কার হাসির আভাস দেখা গেল। সুধীন কী বলবে বুঝতে পারল না।

‘আসুন আমার সঙ্গে।’

সুধীন এ আদেশও অমান্য করতে পারল না। ভদ্রলোকের চোখে এবং কথায় একটা সম্মোহনী শক্তি আছে সেটা মানতেই হবে। তার নিজেরও যে কৌতূহল হচ্ছে না তা নয়। কেমন ছবি আঁকেন ভদ্রলোক? কারা আসে সিটিং দিতে মাঝরাত্তিরে? কীভাবে তাদের জোগাড় করা হয়?

‘এক আমার স্টুডিওতে ছাড়া বাড়ির আর কোথাও ইলেকট্রিসিটি নেই,’ কেরোসিন ল্যাম্পের আবছা হলদে আলোয় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে

উঠতে বললেন ভদ্রলোক । —‘বাকি সব কানেকশন কেটে দিয়েছি ।’

আশ্চর্য এই যে, ল্যাণ্ডিং-এ, সিঁড়ির দেয়ালে, বৈঠকখানায়—কোথাও একটিও পেন্টিং নেই । সবই কি তাহলে স্টুডিওতে জড়ো করে রেখেছেন ভদ্রলোক ?

তিনতলায় উঠে বাঁয়ে ঘুরেই সামনে একটা দরজা । সেই ঘরে সুধীনকে নিয়ে ঢুকে দরজা আবার বন্ধ করে দিয়ে বাঁয়ে দেয়ালে একটা সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোতে ঘরটা ভরে গেল ।

এটাই যে স্টুডিও সেটা আর বলে দিতে হয় না । আঁকার সব সরঞ্জামই রয়েছে এখানে । ঘরের এক পাশে আলোর ঠিক নিচে ইজেকে একটা সাদা ক্যানভাস খাটানো রয়েছে । তাতে নতুন ছবি শুরু হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে ।

সরঞ্জামের বাইরে যেটা আছে সেটা হল দেয়ালে টাঙানো এবং মেঝেতে ডাঁই করে রাখা পোর্ট্রেট । কমপক্ষে একশো তো হবেই । মেঝেরগুলো এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে না ধরলে বোঝা যাবে না । যেগুলো চোখের সামনে জলজ্যাস্ত সে হল দেয়ালে টাঙানো পোর্ট্রেটগুলো । অধিকাংশই পুরুষের ছবি । সুধীন তার তৈরি চোখে বুঝে নিল সাবেকী ঢং-এ আঁকা পেন্টিংগুলোতে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় আছে । এখানেও সুধীনের মনে হল যে সে যেন অনেক জ্যাস্ত মানুষের ভিড়ে এসে পড়েছে—এবং সবাই চেয়ে আছে তারই দিকে—কমপক্ষে পঞ্চাশ জোড়া চোখে ।

কিন্তু এরা সব কারা ? দু একটা মুখ চেনা চেনা মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু—

‘কেমন লাগছে ?’ প্রশ্ন করলেন গগন চৌধুরী ।

‘উচু দরের কাজ,’ স্বীকার করতে বাধ্য হল সুধীন ।

‘অথচ অয়েল পেন্টিং-এ পোর্ট্রেট আঁকার রেওয়াজই লোপ পেয়ে গেছে । সেখানে আমাদের মতো শিল্পীদের কী দশা হয় ভেবে দেখেছেন ?’

‘কিন্তু এ ঘরে এসে তো মনে হচ্ছে না যে আপনার কাজের অভাব আছে ।’

‘কী বলছেন ! সে তো এখন । এককালে পনের বছর ধরে সমানে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছি—একটি লোকও সাড়া দেয়নি । শেষটায় বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিই ।’

‘তারপর ? আবার আঁকা শুরু হল কী করে ?’

‘অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ।’

সুধীন আর কিছু বলল না, কারণ তার সমস্ত মন এখন ছবির দিকে । ইতিমধ্যে সে তিনজনকে চিনতে পেরেছে । একজন মাস চারেক হল মারা গেছেন । বিখ্যাত গায়ক অনন্তলাল নিয়োগী । সুধীন আসরে বসে তাঁর গান শুনেছে বছর আষ্টেক আগে ।

দ্বিতীয়জন হলেন অসীমানন্দ স্বামী—এককালে স্বদেশী করে পরে সন্ন্যাসী

হয়ে যান। ইনিও মারা গেছেন বছরখানেক হল। কাগজে ছবি বেরিয়েছিল, সুধীনের মনে আছে।

তৃতীয় ব্যক্তি হলেন এয়ার ইন্ডিয়া বাঙালী পাইলট ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী। লগুন যাবার পথে বোইং দুর্ঘটনায় আড়াইশো যাত্রীসমেত ঐরও মৃত্যু হয় বছর তিনেক আগে। সুধীন যে শুধু ছবি থেকেই চিনল ঐকে তা নয়; একবার আপিসের কাজে রোম যাবার পথে প্লেনের ককপিটে ঐর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

সুধীন একটা প্রশ্ন না করে পারল না।

‘ঐরা কি শুধুই পোর্ট্রেট করানোর উদ্দেশ্যে এসেছিলেন? সে ছবি নিজেরা নেননি কখনো?’

গগন চৌধুরীকে এই প্রথম গলা ছেড়ে হাসতে শুনল সুধীন।

‘না, মিস্টার সরকার, পোর্ট্রেটে ঐদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য আঁকা।’

‘আপনি কি বলতে চান রোজই কেউ না কেউ এসে আপনাকে সিটিং দেন?’

‘সেটা আর একটুক্ষণ থাকলেই দেখতে পাবেন। আজও লোক আসবে।’

সুধীনের মাথা ক্রমেই গুলিয়ে যাচ্ছে।

‘কিন্তু ঐদের সঙ্গে যোগাযোগটা কীভাবে—?’

‘দাঁড়ান, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার সিসটেমটা একটু আলাদা।’

তাক থেকে একটা বেশ বড় খাতা নামিয়ে সুধীনের দিকে নিয়ে এলেন গগন চৌধুরী।

‘এটা খুলে দেখুন এতে কী আছে।’

আলোর তলায় নিয়ে গিয়ে খাতাটা খুলল সুধীন।

খাতার পাতার পর পাতায় আঠা দিয়ে সাঁটা রয়েছে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে কাটা মৃত্যুসংবাদ। অনেকগুলো খবরের সঙ্গে ছবিও রয়েছে। সুধীন দেখল যে কিছু কিছু কাটিং-এর পাশে পেনসিল দিয়ে চিকে দেওয়া রয়েছে।

‘পেনসিলের দাগ হলে বুঝতে হবে তাদের ছবি আঁকা হয়ে গেছে,’ বললেন গগন চৌধুরী।

‘কিন্তু যোগাযোগটা করেন কী করে সেটা তো—’

গগন চৌধুরী সুধীনের হাত থেকে খাতাটা নিয়ে আবার সেটা তাকে রেখে দিলেন। তারপর ঘুরে এগিয়ে এসে বললেন, ‘ওটা সকলে পারে না, আমি পারি। এটা চিঠি বা টেলিফোনের কস্ম নয়। ঐরা যেখানে আছেন সেখানে তো আর টেলিফোন নেই বা ডাক বিলির ব্যবস্থাও নেই। ঐদের জন্য অন্য উপায়ের প্রয়োজন হয়।’



সুধীনের হাত পা ঠাণ্ডা, গলা শুকিয়ে কাঠ। তাও একটা প্রশ্ন না করলেই নয়।

‘আপনি কি বলতে চান এই সব লোকের পোর্ট্রেট করা হয়েছে এঁদের মৃত্যুর পর?’

‘মৃত্যুর আগে এঁদের খবর পাবো কি করে, সুধীনবাবু। আমি আর কলকাতার কটা লোককে চিনি? মৃত্যু না হলে তো তাঁরা আর তাঁদের গণ্ডীর বাইরে বেরোতে পারেন না! একমাত্র মৃত ব্যক্তিই তো সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন! তাঁদের সময়েরও অভাব নেই, ধৈর্যেরও অভাব নেই। ছবি যতক্ষণ না নিখুঁত হচ্ছে ততক্ষণ ঠায়ে বসে থাকবেন ওই চেয়ারে।’

ঢং-ঢং-ঢং—

রাত্রের নিস্তরঙ্গতা বিদীর্ণ করে একটা ঘড়ি বেজে উঠল। সিঁড়ির পাশে যে ঘড়িটা দেখেছিল সুধীন সেটাই বোধহয়।

‘বারোটা,’ বললেন গগন চৌধুরী। ‘এইবার আসবেন।’

‘কে?’—সুধীনের গলার স্বর অস্বাভাবিক রকম চাপা ও রুদ্ধ। তার মাথা কিম্বিকিম্বিক করছে।

‘আজকে যিনি বসবেন তিনি। ওই তাঁর পায়ের শব্দ।’

সুধীন শ্রবণশক্তিটা এখনও হারায়নি, তাই সে স্পষ্ট পেল বাইরে নিচ থেকে জুতোর শব্দ।

‘এসে দেখুন।’—গগন চৌধুরী এগিয়ে গেছেন পাশের একটা জানালার দিকে। ‘আমার কথা বিশ্বাস না হয় এসে দেখুন।’

এও কি সেই সম্মোহনী শক্তি? যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গিয়ে সুধীন গগন চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে দৃষ্টি দিল। তারপর তার অজান্তেই একটা আত্মস্বর বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে—

‘একে যে চিনি!’

সেই দৃপ্ত মিলিটারি ভঙ্গি, সেই দীর্ঘ গড়ন, সেই ছাই রঙের সাফারি সুট।

ইনিই ছিলেন সুধীনের বস—নগেন্দ্র কাপুর।

সুধীনের মাথা ঘুরছে। টাল সামলানোর জন্য সে ইজেলটাকে জাপটে ধরে ফেলল।

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের আওয়াজ উপরে উঠে আসছে। কাঠের সিঁড়িতে জুতোর ক্রমবর্ধমান শব্দে সমস্ত বাড়ি গমগম করছে।

এবার আওয়াজ থামল।

নৈশব্দের মধ্যে গগন চৌধুরী মুখ খুললেন আবার।

‘যোগস্থাপনের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না, সুধীনবাবু? ভেরি সিম্পল—এই ভাবে হাতছানি দিলেই চলে আসে!’

সুধীন বিস্ময়িত চোখে দেখল দোরোখা শালের ভিতর থেকে গগন চৌধুরীর ডান হাতটা বেরিয়ে সামনে প্রসারিত। সে হাতে মাংস, চামড়া কিছুই নেই—খালি হাড়!

‘যে হাতে ডাকা, সে হাতেই আঁকা!’

সংজ্ঞা হারাবার আগের মুহূর্তে সুধীন শুনল স্টুডিওর বন্ধ দরজার বাইরে থেকে টোকা পড়ছে—

খট্ খট্ খট্—খট্ খট্ খট্—

খট্ খট্ খট্—খট্ খট্ খট্—

‘দাদাবাবু ! দাদাবাবু !’

এক ঝটকায় ঘুমটা ভেঙে গিয়ে দিনের আলোয় সুধীনকে আবার তখনই চোখটা কঁচকে বন্ধ করে নিতে হল । বাপ্পে—কী ভয়ংকর স্বপ্ন !

‘দরজা খুলুন । দাদাবাবু !’

চাকর অধীরের গলা ।

‘দাঁড়া, এক মিনিট ।’

সুধীন বিছানা ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিল । অধীরের মুখে গভীর উদ্বেগ ।

‘আপনি এত বেলা অবধি—’

‘জানি । ঘুমটা একটু বেশি হয়ে গেছে ।’

‘এত হৈ হুলা বাড়ির সামনে, কিছুই টের পেলেন না ?’

‘হৈ হুলা ?’

‘চৌধুরীবাড়ির বড়বাবু যে মারা গেলেন কাল রাত্তিরে । গগনবাবু । চৌরশি বছর বয়স হয়েছিল । ভুগছিলেন তো অনেকদিন । ঘরে বাতি জ্বালা থাকত রাত্তিরে দেখেননি ?’

‘তুই জানতিস ওঁর অসুখ ?’

‘জানব না ? ওনার চাকর ভগীরথ—তার সঙ্গে তো দেখা হয় রোজ বাজারে ।’

‘বোঝো !’